Tuesday, November 12, 2024

সর্বজনকথা

আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিশ্লেষণমূলক সংকলন

সর্বজনকথা

১৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

শেখ হাসিনা সরকার: দুর্নীতি ও নিপীড়নের খতিয়ান

কল্লোল মোস্তফা

শিক্ষার্থী-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গত ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন চরম দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী স্বৈরশাসনের অবসান ঘটেছে। কেন একবার বিপুল ভোটে নির্বাচিত শেখ হাসিনা সরকার চরমভাবে ধিকৃত এবং প্রত্যাখ্যাত হলো তার রাজনৈতিক অর্থনীতি বিবেচনায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামল জুড়ে ভোটাধিকার ও বাকস্বাধীনতা হরণ, বিরোধী দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও পুলিশি নিপীড়ন, ব্যাংক লুণ্ঠন, ব্যাপক দুর্নীতি ও অর্থপাচার, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ধ্বস, দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক উর্ধ্বগতি, ভারতের অন্যায়ের কাছে নতজানু অবস্থান ইত্যাদি কারণে জনক্ষোভ বিস্তৃত হচ্ছিলো। ন্যায্য দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী-জনতার নির্বিচার হত্যাকান্ডের কারণে সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। এই প্রবন্ধে শেখ হাসিনা সরকারের দেড় দশকের সেই দুর্নীতি ও দুঃশাসনের মূলদিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

ত্র-জনতার এক রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের অবসানের প্রাথমিক কারণ হলো, কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-নতার ওপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্বিচার গুলি বর্ষণে শতশত মানুষ হত্যা। এ সময় কমপক্ষে ৮০০ মানুষ নিহত ও ১৮ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার খবর পাওয়া গেছে।।[১]

ব এই প্রাথমিক কারণের পেছনে রয়েছে শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনামলজুড়ে ভোটাধিকার ও বাকস্বাধীনতা হরণ, বিরোধী দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও পুলিশি নিপীড়ন, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ঋণের নামে ব্যাংক লুণ্ঠন, সরকার ঘনিষ্ঠদের ব্যাপক দুর্নীতি ও অর্থপাচার, সচিবালয় থেকে বিচার বিভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক দলীয়করণ, দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক ঊর্ধ্বগতি, ভারতের সঙ্গে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট গভীর জন অসন্তোষ। গণমাধ্যমের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বানোয়াট পরিসংখ্যান আর বিভিন্ন দৃশ্যমান অবকাঠামো উন্নয়নকেন্দ্রিক প্রচারণার মাধ্যমে দুঃশাসনকে আড়াল করার চেষ্টা করা হলেও তা হাসিনা সরকারের চূড়ান্ত পতন ঠেকাতে পারেনি। এই প্রবন্ধে শেখ হাসিনা সরকারের দুঃশাসনের মূলদিকগুলো উপস্থাপন করা হলো।

নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদ

২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। কিন্তু এরপর তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে এমন এক নির্বাচনী ব্যবস্থা কায়েম করেন, যে ব্যবস্থায় পাঁচ বছর পরপর নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও কোনো ধরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ ছিল না। এসব নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ করেনি বা করতে পারেনি, আর অংশগ্রহণ করলেও ব্যাপক ভোট জালিয়াতির শিকার হয়। জালিয়াতি শুধু যে নির্বাচনের দিন হয়েছে তা নয়, নির্বাচনের আগের সময়গুলোতেও বিরোধী দলগুলোকে স্বাধীনভাবে কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে দেওয়া হয়নি, হাজার হাজার গায়েবি মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করে, এলাকা ছাড়া করে নির্বাচনের মাঠ প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন করা হয়।

২০১৪ সালে বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণ ছাড়াই একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ১৫৩টি আসন নিয়ে সরকার গঠন করে। এরপর ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে

বিরোধী দলগুলো অংশ নিলেও সরকারি প্রশাসন ও দলীয় কর্মীদের ব্যবহার করে আগের রাতেই ব্যালটে সিল মেরে নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ। আর ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিরোধী দল ছাড়া নিজ দলীয় নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী করে 'ডামি' প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে নির্বাচনে জয় লাভ করে তারা।

এভাবে বাংলাদেশে পাঁচ বছর পরপর আনুষ্ঠানিক নির্বাচন করলেও তাতে জনগণের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। বাবদিহিহীন এই একচেটিয়া শাসনের ফলেই দেশে মানবাধিকার ও আইনের শাসনের মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং অর্থনৈতিক সংকটে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।

. তপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ

খ হাসিনার শাসনামলে রীতিমতো আইন করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। এ জন্য ব্যবহার করা হয় ২০১৩ সালে সংশোধিত আইসিটি অ্যাক্ট-২০০৬, ২০১৮ সালে প্রণীত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং ২০২৩ সালে প্রণীত সাইবার রাপত্তা আইন। এসব আইনের মাধ্যমে 'ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা', 'মানহানি', 'মিথ্যা তথ্য প্রচার', 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র বিরোধিতা করা ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই কাউকে আটক ও অনির্দিষ্টকাল কারাগারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

এভাবে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী থেকে সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মোট সাত হাজার একটি মামলা হয়।[২] ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা এক হাজার ৪৩৬টি মামলার তথ্য বিশ্লেষণ করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস)। সে অনুসারে, পাঁচ বছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় চার হাজার ৫২০ জন অভিযুক্ত এবং এক হাজার ৫৪৯ জন গ্রেপ্তার হন। এ সময় মাসে গড়ে মামলা করা হয় প্রায় ২৪টি এবং গ্রেপ্তার করা হয় গড়ে ২৬ জনকে। মামলায় অভিযুক্তের মধ্যে ৩২ শতাংশের বেশি রাজনীতিবিদ, ২৯ দশমিক ৪০ শতাংশ সাংবাদিক। আর অভিযোগকারীদের প্রায় ৭৮ শতাংশই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত।

> “
> *এভাবে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী থেকে সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মোট সাত হাজার একটি মামলা হয়।*

সাংবাদিকরা অভিযুক্ত হয়েছেন সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য, যাদের মধ্যে ঢাকার বাইরের সাংবাদিকেরাই বেশি। ফেসবুকে পোস্ট বা মন্তব্য করার দায়ে এ আইনে মামলা হয়েছে ৯০৮টি, আর ৫২৮টি মামলা হয়েছে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর মানহানির অভিযোগে মামলা হয় ১৯০টি, যার বেশির ভাগ মামলা করেন

তার সমর্থকরা। এরপর বেশি মামলা করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় শিশুরাও বাদ যায়নি। এ সময় মামলায় ২৮ শিশুকে অভিযুক্ত করা হয় এবং ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৩] মামলা ও গ্রেপ্তার ছাড়াও সংবাদ প্রবাহের ওপর নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় ছিল দলীয় ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সংবাদমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া, সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ প্রয়োগ।

এ ছাড়া নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করতে সরকার বিভিন্ন সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া থেকে শুরু করে সবুক, গুগল, টিকটকের মতো বৈশ্বিক প্রযুক্তি করপোরেশনগুলোর কাছে বিভিন্ন ইউজার অ্যাকাউন্ট ও পেইজ বন্ধ করা, কনটেন্ট মুছে ফেলার অনুরোধ পাঠিয়েছে।

া ও বিচার বহির্ভূত হত্যা

খ হাসিনার সরকার বিরোধী দলের আন্দোলন ও ভিন্নমত দমনের জন্য গুমের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত ছিল। গত দেড় দশকে বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে বাসা, অফিস কিংবা রাস্তা থেকে মানুষকে তুলে নিয়ে বর্তীতে অস্বীকার করা হয়। তাদের অনেকে ফিরে আসেন, কারো লাশ পাওয়া যায়, আবার অনেকে দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ। স্বজনরা দিনের পর দিন বিভিন্ন বাহিনীর দ্বারে দ্বারে ঘুরেও তাদের কোনো খোঁজ পাননি।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনের (এএইচআরসি) হিসাবে, ২০০৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দেশে ৬২৩ ব্যক্তি গুমের শিকার হন। তাদের মধ্যে ৮৪ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছেন বা পরবর্তী সময়ে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে ৩৮৩ জনকে। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ১৫৩ ব্যক্তি আর তিনজনের বিষয়ে কোনো তথ্য জানা যায়নি।

গুমের ঘটনায় কুখ্যাত গোপন বন্দীশালা 'আয়না ঘর' নামে পরিচিতি পায়, যা ছিল সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিরেকটরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্সের (ডিজিএফআই) নিয়ন্ত্রণাধীন। হাসিনা সরকার গুমের শিকার ব্যক্তিরা নিজেরা পালিয়ে আছেন বলে স্বজনদের সঙ্গে পরিহাস করলেও দেখা যায়, সরকার পতনের দুইদিনের মধ্যে গুমের শিকার অন্তত তিনজন 'আয়না ঘর' থেকে মুক্তি পান।[৪]

> *২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, এনকাউন্টার ও পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে নিহতের সংখ্যা ২ হাজার ৬১৭।*

সন্ত্রাস, জঙ্গি, মাদক দমনের নামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যা ছিল নিয়মিত ঘটনা। সংবাদপত্রের পাতা খুললেই দেখা যেত ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ বা এনকাউন্টারে সন্ত্রাসী, জঙ্গি বা মাদক চোরাকারবারি নিহতের খবর। ঘটনাগুলোর বর্ণনা থাকত প্রায় হুবহু এক—কথিত সন্ত্রাসীকে নিয়ে অস্ত্র বা মাদক উদ্ধার অভিযানে গিয়ে সন্ত্রাসীদের হামলার

মুখে ক্রসফায়ারে বা বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়ার কথা। আইন ও সালিস কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, এনকাউন্টার ও পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে নিহতের সংখ্যা ২ হাজার ৬১৭।[৫]

ব্যাংক কেলেঙ্কারি

খ হাসিনার শাসনামলে ব্যাংক থেকে ঋণের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন ছিল নিয়মিত ঘটনা। মেগাসিরিয়ালের ..ভিন্ন পর্বের মতো গত দেড় দশকে হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপ, বেসিক ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ি, ফারমার্স ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক কেলেঙ্কারির ঘটনাগুলো ঘটেছে। যে প্রক্রিয়ায় এই কেলেঙ্কারির ঘটনাগুলো ঘটেছে তার ..ধ্য রয়েছে—প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়া; সরাসরি জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ লুণ্ঠন; াংক মালিক হয়ে লুটপাট অর্থাৎ স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগে ব্যাংক উদ্যোক্তা হয়ে জনগণের হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন; নিয়ম ভঙ্গ র বেসরকারি ব্যাংক মালিকদের পরস্পরকে অস্বাভাবিক মাত্রায় ঋণ প্রদান; ব্যাংকের টাকা লুটে ব্যাংক মালিক এবং পরবর্তীতে আরও লুটপাট; রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মদদে সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ব্যাংক দখল; রাজনৈতিক মদদে য়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমডি বা পরিচালনা পর্ষদের বিভিন্ন সুবিধার বিনিময়ে ব্যাংক ঋণ ও লুটপাট, ব্যাংক লুটে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা, যেমন: অনিয়ম-দুর্নীতির প্রশ্রয় প্রদান, লুণ্ঠনের হোতাদের বিচার না া, খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধার না করা, উদারভাবে ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা প্রদান, ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করে ব্যাংক পরিচালকদের মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রতিবছর জনগণের করের অর্থ লুটপাটের শিকার ব্যাংকগুলোতে ঢালা ইত্যাদি।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে যখন ক্ষমতায় আসে, তখন ব্যাংকখাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। হাসিনা সরকারের মদদে সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ঋণের নামে লুণ্ঠনের কারণে ১৫ বছরের শাসনকালে খেলাপি ঋণ আট গুণ বেড়ে ২০২৪ সালের মার্চ নাগাদ এক লাখ ৮২ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অবশ্য এরসঙ্গে বারবার পুনঃতফসিল করা দুই লাখ ৫৭ হাজার কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ যোগ করলে প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় চার লাখ ৩৯ হাজার কোটি টাকা, যা ব্যাংকখাতে মোট ঋণের এক-তৃতীয়াংশের বেশি।[৬]

শেয়ারবাজার কারসাজি

গত ১৫ বছরে কারসাজি ও জালিয়াতির মাধ্যমে দেশের শেয়ারবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অন্তত এক লাখ কোটি টাকা লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটেছে।[৭] এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে ২০১১ সালে। সে সময় লোকসানের কারণে বিনিয়োগকারীদের আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনার পর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে শেয়ারবাজার জালিয়াতির পেছনে ৬০ জনকে চিহ্নিত করা হয়, যাদের মধ্যে বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান ও শেখ হাসিনার বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মতো সরকার ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালীরা রয়েছে।[৮] তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, যে প্রক্রিয়ায় শেয়ারবাজার কারসাজি করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, কৃত্রিমভাবে শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি, প্লেসমেন্ট বাণিজ্য, আইপিও প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, অমনিবাস হিসাবের আড়ালে সন্দেহজনক লেনদেন ইত্যাদি। প্রতিবেদনে অপরাধীদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হলেও তাদের কোনো শাস্তি হয়নি। ফলে, পরবর্তীতেও শেয়ারবাজারে কারসাজি চলতে থাকে।[৯]

> *যে প্রক্রিয়ায় শেয়ারবাজার কারসাজি করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, কৃত্রিমভাবে শেয়ারের মূল্যবৃদ্ধি, প্লেসমেন্ট বাণিজ্য, আইপিও প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, অমনিবাস হিসাবের আড়ালে সন্দেহজনক লেনদেন ইত্যাদি। প্রতিবেদনে অপরাধীদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হলেও তাদের কোনো শাস্তি হয়নি। ফলে, পরবর্তীতেও শেয়ারবাজারে কারসাজি চলতে থাকে।*

লানিখাতে লুণ্ঠন

ন্যুৎ ও জ্বালানি সংকট সমাধানের নামে হাসিনা সরকার দেশি-বিদেশি বেসরকারি মালিকানাভিত্তিক ও বিদেশি ঋণনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও আমদানি নির্ভর জ্বালানি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে দেয়।

ভিন্ন দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সরকারকে যেন কোনো জবাবদিহি করতে না হয়, সেজন্য রীতিমতো আইন করে আদালতে বিচার চাওয়ার সুযোগ পর্যন্ত রহিত করা হয়।[১০]

বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের কথা বলে বেসরকারি মালিকানায় একের পর এক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে সেগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে বিপুল পরিমাণ ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হয়, বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকারি-বেসরকারি খাতে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নেওয়া হয় এবং দেশীয় গ্যাস উত্তোলন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ না নিয়ে বিদেশ থেকে ব্যয়বহুল এলএনজি ও কয়লা আমদানির ব্যবস্থা করা হয়।

২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে দেওয়া ক্যাপাসিটি চার্জ বা ভাড়ার পরিমাণ প্রায় এক লাখ পাঁচ হাজার কোটি টাকা।[১১] ঘাটতি মেটানোর কথা বলে দফায় দফায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৫ বছরে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে ১৪ বার।[১২] সরকার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে ১১ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন[১৩], মাতারবাড়ি প্রকল্পের জন্য জাপানের কাছ থেকে চার দশমিক চার বিলিয়ন[১৪], কয়লাভিত্তিক পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক দশমিক ৯৮ বিলিয়ন[১৫] এবং রামপাল কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলার[১৬] বৈদেশিক ঋণ নেয়।

> *ঘাটতি মেটানোর কথা বলে দফায় দফায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৫ বছরে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে ১৪ বার।*

এসব বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও জ্বালানি আমদানি বাবদ বাড়তি খরচ দেশের অর্থনীতির ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছে। সামনে কয়লা ও এলএনজি আমদানি আরও বাড়বে, সেইসঙ্গে ২০২৭ সাল থেকে রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু হলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ আরও বাড়বে। দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় এভাবে বিপুল ঋণের বোঝা তৈরি হলেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের কোনো সমাধান হয়নি, যার খেসারত দিতে হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদেরকেও। গ্যাস সংকটের পাশাপাশি লাগামছাড়া লোডশেডিংয়ে শিল্পকারখানায় উৎপাদনে া নামার ঘটনা ঘটেছে।[১৭]

ীতি ও অর্থপাচার

ীর্ঘ স্বৈরশাসনে এমন এক স্বজনতোষী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছিল, যেখানে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, বসায়ী ও মাস্তানদের সমন্বয়ে এক মাফিয়া রাজত্বের কায়েম হয়। এই মাফিয়ারা ক্ষমতাসীন পরিবারের আশীর্বাদে রীতিমতো ায়মুক্তি নিয়ে দখল, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও অর্থপাচারে লিপ্ত হয়। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাহীনতার মধ্যেও সরকারের মন্ত্রীদের রুদ্ধে দুর্নীতির যেসব খবর প্রকাশিত হয় তার মধ্যে কয়েকটি হলো—উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের আগে জমি কিনে জমির দাম বাড়িয়ে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি, অবৈধ বালু উত্তোলনে পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কেনাকাটায় বিপুল ীতি, ভুয়া দলিলের মাধ্যমে খাসজমি দখল, নিয়োগ দুর্নীতি ইত্যাদি।

সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে স্বর্ণ চোরাচালান, মাদক চোরাকারবার, মানবপাচার, অর্থপাচার করে বিদেশে জমি-বাড়ি কেনার খবর পাওয়া যায়। সরকারঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে একচেটিয়া মুনাফা করেছে, ঋণের নামে ব্যাংক লুণ্ঠন করেছে এবং হুন্ডি ও আমদানি-রপ্তানিতে মূল্যের তারতম্যের মাধ্যমে অর্থপাচার করেছে। সরকারের আমলারা দুর্নীতি করে শত হাজার কোটি টাকা অবৈধ অর্থ অর্জন করেছে। সরকারি দলের মাস্তান ও পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় চাঁদাবাজি করেছে। খোদ পুলিশ ও র‍্যাব প্রধান বেনজীর দুর্নীতির অবৈধ অর্থে শত শত একর জমি কিনে ও দখল করে রিসোর্ট, বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদ নিজের ভাইদের পাসপোর্ট জালিয়াতি ও সামরিক কেনাকাটায় দুর্নীতি করেছেন। ক্ষমতাসীন দলের নেতা, প্রকৌশলী ও ঠিকাদার মিলে 'সিন্ডিকেট' তৈরির মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের সমস্ত ঠিকাদারি কাজের অর্ধেক মাত্র পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে পাইয়ে দিয়েছেন।

এভাবে বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতিলব্ধ আয়, ব্যাংক থেকে লোপাট করা ঋণের অর্থ ও আমদানি-রপ্তানিতে মূল্যের তারতম্যের মাধ্যমে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হয়েছে, যে অর্থ ব্যবহার করে আমলা, রাজনীতিবিদ, সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ব্যাংকাররা কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে বিপুল সম্পত্তি কিনেছে। দুর্নীতির মাত্রা ও পাচারের প্রকৃত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটির (জিএফআই) প্রতিবেদন থেকে। সংস্থাটির ২০২১ সালের প্রতিবেদন অনুসারে, শুধু বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির মূল্য বেশি দেখানো এবং রপ্তানিতে মূল্য কম দেখানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৮২৭ কোটি ডলার পাচার হয়।[১৮]

বিদেশি ঋণনির্ভর ব্যয়বহুল উন্নয়ন প্রকল্প

২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে দেশের বৈদেশিক ঋণ চারগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার[১৯] থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে।[২০] অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে যত বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হয়, তার ৭৬ শতাংশই নেওয়া হয় হাসিনা সরকারের আমলে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় সেই তুলনায় রপ্তানি আয় ও রিজার্ভ বাড়েনি। কারণ এই বিদেশি ঋণ নিয়ে এমন সব ব্যয়বহুল ও অপচয়মূলক প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছে, যা থেকে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে না। তাছাড়া ঋণ নিয়ে করা প্রকল্পের ব্যয় যদি অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, তাহলেও সেই প্রকল্প র অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক থাকে না।

> *বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে যত বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হয়, তার ৭৬ শতাংশই নেওয়া হয় হাসিনা সরকারের আমলে। কিন্তু বৈদেশিক ঋণ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় সেই তুলনায় রপ্তানি আয় ও রিজার্ভ বাড়েনি।*

,,সব মেগাপ্রকল্পের মাধ্যমে সরকার উন্নয়নের প্রচারণা চালিয়েছে, সেগুলো বিশ্বের মধ্যে অন্যতম ব্যয়বহুল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন: প্রতি কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের খরচ প্রতিবেশী ভারত ও চীন তো বটেই, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইউরোপের তুলনায়ও বেশি পড়েছে বাংলাদেশে।[২১] বাংলাদেশের বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি প্রকল্পও বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল তকমা পেয়েছে।[২২] ঢাকায় প্রথম মেট্রোরেলের নির্মাণ ব্যয়ও সাম্প্রতিক সময়ে নির্মিত অন্যান্য দেশের ব্যয়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি পড়েছে।[২৩] বাংলাদেশের কয়লা, গ্যাস ও পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর নির্মাণ ব্যয়ও বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে অনেক বেশি।[২৪] এই ধরণের অস্বাভাবিক ব্যয়ের পেছনে দায়ী হলো অনিয়ম, দুর্নীতি ও প্রকল্প পরিকল্পনার সমস্যা। বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে এসব ব্যয়বহুল অবকাঠামো প্রকল্প নির্মাণ করে সরকারঘনিষ্ঠ দেশি-বিদেশি গোষ্ঠী লাভবান হলেও দেশের ঋণের বোঝা বেড়েছে ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ পড়েছে। যার খেসারত হিসেবে টাকার অবমূল্যায়ন ও ব্যাপক মূল্যস্ফীতিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠে যায়।

> *প্রতি কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের খরচ প্রতিবেশী ভারত ও চীন তো বটেই এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইউরোপের তুলনায়ও বেশি পড়েছে বাংলাদেশে।*

বৈষম্য বৃদ্ধি

হাসিনা শাসনামলে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যাপক হারে। একদিকে অর্থনৈতিক সংকটে তুলনামূলক কম দামে চাল-ডাল-তেল-চিনি কেনার জন্য টিসিবি আর ওএমএসের লাইন দীর্ঘ হয়েছে, ব্রয়লার মুরগির উচ্চমূল্যের কারণে নিম্ন আয়ের মানুষের মুরগির গিলা-কলিজা কেনা বেড়েছে, অন্যদিকে দেশে বিলাসবহুল গাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট বিক্রি বেড়েছে।

যখন দেশের বেশিরভাগ মানুষ দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে হিমসিম খেয়েছেন, অনেকেই খাওয়া কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, তখনও দেশে কোটিপতির সংখ্যা বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, দেশের সবচেয়ে বেশি ধনী পাঁচ শতাংশ মানুষের হাতে এখন দেশের মোট আয়ের ৩০ দশমিক শূন্য চার শতাংশ পুঞ্জিভূত। অন্যদিকে সবচেয়ে গরীব পাঁচ শতাংশ মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র দশমিক ৩৭ শতাংশ।[২৫]

> *“বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, দেশের সবচেয়ে বেশি ধনী পাঁচ শতাংশ মানুষের হাতে এখন দেশের মোট আয়ের ৩০ দশমিক শূন্য চার শতাংশ পুঞ্জিভূত। অন্যদিকে সবচেয়ে গরীব পাঁচ শতাংশ মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র দশমিক ৩৭ শতাংশ।*

নার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুযায়ী, দেশের আয়ে সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে গরীব পাঁচ শতাংশের ভাগ ছিল যথাক্রমে ২৪ দশমিক ৬১ এবং শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ।[২৬] অর্থাৎ গত একযুগে দেশের মোট আয়ে পাঁচ শতাংশ ধনীর ভাগ যখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে, সবচেয়ে দরিদ্র পাঁচ শতাংশের ভাগ তখন আগের চেয়ে কমে অর্ধেক হয়েছে। এ কারণেই আয় বৈষম্যবিষয়ক গিনি সহগ ২০১০ সালের দশমিক ৪৫৮ থেকে ২০২২ সাল শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশমিক ৪৯৯, যা উচ্চ আয়বৈষম্যকেই নির্দেশ করে।

দেশের সম্পদ যে কতিপয় বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে পুঞ্জিভূত হয়েছে তা ক্রেডিট সুইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দেওয়া তথ্য থেকেও বোঝা যায়। দেশে ৫০ কোটি ডলার বা পাঁচ হাজার কোটি টাকার বেশি পরিমাণের সম্পদ আছে ২১ ব্যক্তির কাছে।[২৭] হাসিনা সরকার এই বৈষম্য বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ‘স্বাভাবিক’ প্রক্রিয়া হিসেবে প্রচার করলেও ওই সরকারের আমলে বিকশিত নির্দিষ্ট ধরণের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর কারণেই তা ঘটেছে। দেশের মালিক গোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদেরকে অতি নিম্ন মজুরি দিয়ে এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তার পেছনে যথেষ্ট ব্যয় না করেই ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে গেছেন। সেইসঙ্গে ছিল ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কিংবা আমদানি-রপ্তানির নামে লুটপাট ও অর্থপাচারের বিপুল সুযোগ।

সরকার ধনীদের তুলনায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকেই বেশি কর আহরণ করেছে। যার ফলে সরকারের কর-রাজস্ব আয়ের ৬৫ শতাংশ পরোক্ষ কর থেকে এসেছে, আর ৩৫ শতাংশ এসেছে প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর বাবদ। এভাবে বৈষম্যমূলক কর-ব্যবস্থা, অতিনিম্ন মজুরি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির অবাধ সুযোগের কারণেই হাসিনা শাসন আমলে এক দেশে দুই অর্থনীতির সৃষ্টি হয়েছিল।

বিচারহীনতা

যেসব ক্ষেত্রে বিচার করলে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক সুবিধা হয়, সেসব মামলার বিচার দ্রুত সম্পন্ন হলেও যেসব ঘটনায় ক্ষমতাসীন দল বা দলের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি-গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেসব ক্ষেত্রে ঘটনার তদন্ত ও বিচার দিনের পর দিন ঝুলে ছিল।

সামান্য কটূক্তি বা মানহানির মামলার অনেকের দ্রুত সাজা হয়ে গেলেও আগুন পুড়ে বা ভবন ধসে শ্রমিক হত্যার জন্য কোনো কারখানা মালিকেরই সাজা হওয়ার নজির নেই। এমনকি রানা প্লাজা ভবন ধস বা তাজরীন গার্মেন্টস অগ্নিকান্ডের মতো দুনিয়া তোলপাড় করা ঘটনারও বিচার সম্পন্ন হয়নি।

অথচ ২০২৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন নাশকতার মামলায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য তের বেলাতেও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে বিচার হয়নি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি বা ঋণের নামে ব্যাংক লুণ্ঠনের অনেক বড় বড় কেলেঙ্কারির। বিচার হয়নি সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি, কুমিল্লার কলেজ ছাত্রী সোহাগী জাহান তনু ংবা নারায়ণগঞ্জের কিশোর তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যাকাণ্ডের।

র্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি ও বেকারত্ব

হাসিনা সরকারের আমলে ব্যয়বহুল অবকাঠামো নির্ভর এমন এক অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে, যেখানে কাগজে-কলমে প্রবৃদ্ধি য়ছে কিন্তু তাতে দেশে তরুণদের যথেষ্ট ও মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান হয়নি। সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ (১ম কোয়ার্টার, জানুয়ারি-মার্চ) অনুসারে, বেকারের হার মোট শ্রমশক্তির ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ বা ২৫ লাখ ১ হাজার দেখানো হলেও, বাস্তবে বেকারের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। কারণ বেকারত্বের এই হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেকারত্বের সংজ্ঞা হিসেবে সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজ করার সুযোগ পাননি এমন মানুষদেরকে ধরা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের মজুরি বিবেচনায় সপ্তাহে মাত্র এক ঘণ্টা কাজ জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো অর্থই বহন করে না।

দেশে বেকারত্বের অনুপাত সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় পরিসংখ্যান ব্যুরোর স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস জরিপ থেকে। ২০২৩ সালের জরিপ অনুসারে, দেশের ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণদের ৩৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ বা এক কোটি ২৮ লাখ পড়ালেখা বা কাজ কোনো কিছুর সঙ্গেই যুক্ত নন, যা দেশে তরুণদের বেকারত্বের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে। বেকার তরুণদের ভেতর আবার উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব বেশি। পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুসারে, কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেই এমন ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারত্বের হার এক শতাংশ হলেও বিশ্ববিদ্যালয় ও সমপর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডিগ্রিধারী উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের হার ১২ শতাংশ। আবার স্বল্প শিক্ষিতদের কর্মসংস্থান হলেও সেটা মূলত অনানুষ্ঠানিক খাতে অতিনিম্নমজুরির হওয়ার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ পথে অভিবাসী হওয়ার হার বেড়ে চলেছে।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) 'মাইগ্রেশন ফ্রম বাংলাদেশ টু ইতালি ভায়া লিবিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে লিবিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগরের ঝুঁকিপূর্ণ পথে নৌকায় করে ইতালিগামী বাংলাদেশি অভিবাসীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। ২০১৯ সালে এই পথে অভিবাসন প্রত্যাশীদের মধ্যে বাংলাদেশির হার ছিল পাঁচ শতাংশ, ২০২১ সাল শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২ শতাংশ এবং ২০২২ সাল শেষে তা ১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০২২ সালে এভাবে ইতালিতে প্রবেশ করেছেন ১৫ হাজার ২২৮ বাংলাদেশি। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল সাত হাজার ৮৩৮। বর্তমানে ইতালিমুখী বোট পিপলের উৎস দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।[২৮]

> *লিবিয়া হয়ে ভূমধ্যসাগরের ঝুঁকিপূর্ণ পথে নৌকায় করে ইতালিগামী বাংলাদেশি অভিবাসীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। ২০১৯ সালে এই পথে অভিবাসন প্রত্যাশীদের মধ্যে বাংলাদেশির হার ছিল পাঁচ শতাংশ, ২০২১ সাল শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২ শতাংশ এবং ২০২২ সাল শেষে তা ১৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।*

তীব্র শ্রমশোষণ

দেশের অর্থনীতির বিকাশ এমন পথে ঘটেছে যে দেশের বেশির ভাগ শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে অপ্রাতিষ্ঠানিক তে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, দেশের শ্রমজীবী মানুষের ৮৪ দশমিক নয় শতাংশই কাজ করছেন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, যেখানে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কর্মপরিবেশ, ইউনিয়ন করার অধিকারসহ কোনো নের শ্রম অধিকারেরই নিশ্চয়তা থাকে না। এসব খাতের শ্রমিকদের 'কাজ নাই, মজুরি নাই' ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। এদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম, সবেতন ছুটি, বিমা, পেনশন, গ্র্যাচুইটির অধিকার থাকে না। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক খাতেও কারখানা মালিকেরা শ্রমিকদের যে মজুরি দেন, তা মানসম্পন্ন জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। দেশের অনেক প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোনো ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়নি। যে ৪২টি খাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়েছে, সেটাও জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় খুবই কম।

দেশের বৃহত্তম রপ্তানিখাত গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ২০২৩ সালে যে ১২ হাজার ৫০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়, তা শ্রমিকদের দাবির অর্ধেক এবং পরিবারসহ দারিদ্রসীমার উপরে বসবাসের জন্য যথেষ্ট নয়। দেশে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশও ভয়ংকর অনিরাপদ, যার ফলে নিয়মিত অকালমৃত্যু ঘটছে। পরিবহন, নির্মাণ, শিল্প, কৃষি, দিনমজুর, ইস্পাত, জাহাজ-ভাঙা, পাথর-ভাঙা ইত্যাদি কোনো খাতেই শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন নেই। দেশে কোন কোন খাতে, কী কারণে, শ্রমিকেরা নিয়মিত হতাহত হচ্ছেন, পঙ্গুত্ববরণ করছেন তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানও সরকার রাখার প্রয়োজন মনে করে না। নেই যথাযথ চিকিৎসা, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও কার্যকর প্রতিরোধের আয়োজন।

বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুসারে, ২০১৩ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে কমপক্ষে নয় হাজার ২৬৩ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন।[২৯] কর্মস্থলে সরাসরি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাড়াও অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের কারণে প্রতিবছর ধুকে ধুকে মৃত্যুবরণ করেন বহু শ্রমিক, যার কোনো হিসাব কারও কাছেই নেই। দেশের বিভিন্ন ইটভাটা, চাতাল, করাত কল, ইস্পাত কারখানা, জাহাজ-ভাঙা শিল্প, রাসায়নিক ও প্লাস্টিক কারখানা, চামড়া, পাথর-ভাঙা ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক কর্মপরিবেশে দিনের পর দিন কাজ করার ফলে ঠিক কত শ্রমিক অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, কত শ্রমিক কর্মক্ষমতা হারিয়ে ধুঁকছেন, তার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না।

ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি

হাসিনা সরকার নিত্যপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে দায়ী করা হলেও দেখা গেছে, সারা বিশ্বে খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের মূল্য যখন কমেছে তখনও বাংলাদেশে নিত্যপণ্যের মূল্য কমেনি, বরং বেড়েছে। ফলে এই মূল্যস্ফীতির পেছনে যে সরকারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নীতি ও বাজার ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতার সম্পর্ক রয়েছে, তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। এভাবে যে কাঠামোগত সমস্যাগুলো উন্মোচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. বাজারে কতিপয় বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একচেটিয়া আধিপত্য;

২. দেশে খাদ্যের চাহিদা ও উৎপাদনের সঠিক পরিসংখ্যানের ঘাটতি এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিষয়ক বিভ্রান্তি;

৩. নিত্যপণ্যের সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগের অপর্যাপ্ততা।

দেশ থেকে কাঁচা চিনি আমদানি করে পরিশোধন করে দেশে বিক্রি করে মাত্র পাঁচটি কোম্পানি—দেশবন্ধু, আবদুল মোনেম, এস আলম, মেঘনা, সিটি।[৩০] এসব গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোই দেশের প্রধান চিনি সরবরাহকারী। দেশে ভোজ্যতেলের ৮৮ শতাংশই আমদানি করে টিকে, মেঘনা, সিটি ও এস আলম—এই চার কোম্পানি।[৩১] দেশে পোলট্রি খাদ্য ও মুরগির বাচ্চার সিংহভাগ উৎপাদন করে অল্প কয়েকটি কোম্পানি, সেইসঙ্গে ডিম ও মাংসের বাজারেরও বড় একটি অংশ তাদের দখলে। বিগ ফোর নামে পরিচিত এই কোম্পানিগুলো হলো কাজী ফার্মস লিমিটেড, আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড, সিপি বাংলাদেশ এবং প্যারাগন পোলট্রি অ্যান্ড হ্যাচারি লিমিটেড।[৩২] বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) এক গবেষণায় দেখা গেছে, ধান–চালের বাজারে সবচেয়ে প্রভাবশালী পক্ষ হিসেবে চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করছে চালকল মালিকরা। তারা প্রতি কেজি চাল ও এর উপজাত বিক্রি করে আট থেকে ১৩ টাকা ৬৬ পয়সা পর্যন্ত মুনাফা করছে।[৩৩]

> *বিদেশ থেকে কাঁচা চিনি আমদানি করে পরিশোধন করে দেশে বিক্রি করে মাত্র পাঁচটি কোম্পানি–দেশবন্ধু, আবদুল মোনেম, এস আলম, মেঘনা, সিটি। এসব গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোই দেশের প্রধান চিনি সরবরাহকারী। দেশে ভোজ্যতেলের ৮৮ শতাংশই আমদানি করে টিকে, মেঘনা, সিটি ও এস আলম–এই চার কোম্পানি। দেশে পোলট্রি খাদ্য ও মুরগির বাচ্চার সিংহভাগ উৎপাদন করে অল্প কয়েকটি কোম্পানি, সেইসঙ্গে ডিম ও মাংসের বাজারেরও বড় একটি অংশ তাদের দখলে। বিগ ফোর নামে পরিচিত এই কোম্পানিগুলো হলো কাজী ফার্মস লিমিটেড, আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড, সিপি বাংলাদেশ এবং প্যারাগন পোলট্রি অ্যান্ড হ্যাচারি লিমিটেড।*

এভাবে দেশের নিত্যপণ্য ও খাদ্যসামগ্রীর ওপর কতিপয় বৃহৎ গ্রুপ অব কোম্পানি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কারণে এরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নানান পরিস্থিতির অজুহাতে ইচ্ছামতো পণ্য আমদানি ও উৎপাদনের পরিমাণ এবং এসবের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে। এদের কারণেই আন্তর্জাতিক বাজারে সয়াবিন তেল, পামতেল, চিনি, আটা তৈরির গম, পেঁয়াজ, মসুর ডাল, ছোলা ও মটর ডাল—এই আটটি পণ্যের দাম রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর সময়কার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কমলেও দেশের বাজারে তার কোনো সুফল পাওয়া যায়নি।[৩৪] সরকারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন সময় এই সিন্ডিকেটের বিষয়টি স্বীকার করলেও সিন্ডিকেটগুলো ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।[৩৫]

নোয়াট পরিসংখ্যান

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বিভিন্ন সময় জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, জনসংখ্যা, মাথাপিছু আয়, কৃষির উৎপাদন ও ভোগ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ইত্যাদি বহু পরিসংখ্যানে জালিয়াতি করা হয়। যেমন: দেশে প্রতিবছর জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে হিসাব দেখানো হয়েছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশের বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার প্রশ্ন বহুদিনের। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসাবের সঙ্গে রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়নি, শিল্পখাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধির সঙ্গে মিল পাওয়া যায়নি বেসরকারি বিনিয়োগের।

করোনা মহামারির সময় জিডিপি নিয়ে কারসাজির বিষয়টি বেশ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। করোনার মধ্যে পরিবহন, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও ছোট শিল্পকারখানা বড় ধরনের বিপাকে পড়লেও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য-উপাত্তে এসব খাতে উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়। যেমন: ২০২০ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত বছরজুড়েই গণপরিবহন চলাচলে নানা ধরনের বিধিনিষেধ থাকার পরেও বিবিএস প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা বা ১০ শতাংশের বেশি মূল্য সংযোজন দেখিয়েছে।[৩৬] ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের তথ্য পর্যালোচনা করে পাঁচ দশমিক ৪৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাময়িক হিসাব দিয়েছিল বিবিএস। এরপরের তিন মাসে করোনা পরিস্থিতির কারণে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতিহীনতা দেখা গেলেও চূড়ান্ত তথ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হয় ছয় দশমিক ৯৪ শতাংশ, যা এর বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।[৩৭] জিডিপির হিসাব নিয়ে স্বয়ং পরিসংখ্যান বিভাগের একজন সাবেক সচিব বলেছিলেন, 'জিডিপি কত হবে, তা আগে ঠিক করা হয়। পরে "ব্যাক ক্যালকুলেশন" করে হিসাব মেলানো হয়।' [৩৮]

বিবিএসের মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যানের সঙ্গেও বাস্তবতার মিল পাওয়া যায় না। এমনকি আন্তর্জাতিক বাজারে সব জিনিসের দাম যখন চড়া, দেশের বাজারেও চাল, ডাল, ভোজ্যতেলসহ সবকিছুর বাড়তি দামে যখন সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে, তখনও বিবিএস মূল্যস্ফীতি কমার হিসাব দেখিয়েছে। যেমন: বিবিএসের হিসেবে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি ২০২১ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় কম ছিল! পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে (মাসওয়ারি) ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ছয় দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ আর জানুয়ারিতে কমে হয় পাঁচ দশমিক ৮৬ শতাংশ! [৩৯] ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে বিবিএসের হিসাবে, শহর ও গ্রামীণ এলাকার জন্য খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার ছিল যথাক্রমে চার দশমিক ৮৫ শতাংশ ও পাঁচ দশমিক ৯৪ শতাংশ। অথচ সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং বা সানেমের হিসেবে ২০২২ সালের জানুয়ারিতে শহর ও গ্রামীণ এলাকার জন্য এই হার ছিল যথাক্রমে ১১ দশমিক ৩৬ শতাংশ ও ১১ দশমিক ২১ শতাংশ, যা বিবিএসের দাবি করা খাদ্য মূল্যস্ফীতি হারের দ্বিগুণের বেশি।[৪০]

রপ্তানির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সরকারের একেক দপ্তরের পরিসংখ্যান ছিল একেক রকম। বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যে বড় পার্থক্য নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন হলেও তা সংশোধন করা হয়নি। একপর্যায়ে আইএমএফ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুললে সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয় যে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে ১০ মাসে প্রকৃত রপ্তানির তুলনায় প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার বেশি দেখিয়েছে ইপিবি। আর এর আগের ১০ অর্থবছরে রপ্তানি বেশি দেখানো হয় প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ডলার।[৪১]

পরিসংখ্যানে জালিয়াতি করে দেশের প্রাণিসম্পদ খাতে টানা পাঁচ বছর ধরে একই হারে প্রবৃদ্ধির মতো বিস্ময়কর ঘটনা ঘটানো ।। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের (ডিএলএস) তথ্য অনুসারে, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত টানা পাঁচ অর্থবছরে দেশে গবাদিপশু ও পোলট্রি উৎপাদন বৃদ্ধি দেখানো হয় দুই দশমিক ৩৮ শতাংশ হারে, যা বানানো পরিসংখ্যানের নজির।[৪২]

তবছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য পণ্য আমদানি করা হলেও সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দাবি করা হয়। অথচ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) খাদ্যশস্য প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশকে বছরে এক কোটি নরও বেশি খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়, যার পরিমাণ ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল এক কোটি পাঁচ লাখ ৩৩ হাজার টন।[৪৩]

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য থেকেও দেখা যায়, বাংলাদেশ প্রতিবছর পাঁচ থেকে প্রায় সাত বিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্যপণ্য আমদানি করে। যার মধ্যে রয়েছে চাল, গম, গুঁড়া দুধ ও ক্রিম, মসলা, ভোজ্যতেল, ডাল, চিনি ইত্যাদি।[৪৪]

বন-নদী-পরিবেশের ক্ষতি

হাসিনা সরকারের উন্নয়ন মডেলের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, পরিবেশ বিষয়ে তারা মোটেই সংবেদনশীল ছিল না। প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের দোহাই দিয়ে দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর স্বার্থে দেড় দশকে অবাধে বন ও নদী দখল, পানি ও বায়ু দূষণ, গাছ ও পাহাড় কাটা, জলাভূমি ভরাট করা হয়েছে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের প্রাণ প্রকৃতি ও পরিবেশ। কলকারখানার বর্জ্য-দূষণে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের নদী দূষিত হয়েছে। ঢাকার চারপাশের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদ দূষণে মৃতপ্রায়। শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে একদিকে বন ও জলাভূমি ধ্বংস করা হয়েছে, অন্যদিকে শিল্প বর্জ্য পরিশোধন না করে সরাসরি তরল বর্জ্য নদী ও জলাশয়ে নির্গত করবার কারণে পানি দূষিত হয়ে চারপাশের কৃষি জমিতে ফসল উৎপাদন কমেছে, খাল-বিলে মাছ পাওয়া যাচ্ছে না, স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, বিশেষ করে শ্বাসকষ্ট ও চর্মরোগে ভুগছেন অনেকে।

এভাবে মুষ্টিমেয় শিল্প মালিকের অতিরিক্ত মুনাফার জোগান দিতে গিয়ে নদ-নদী, খাল-বিল দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লাখ লাখ মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার জোরে অবৈধ বালু উত্তোলন করে শত শত কোটি টাকা লুণ্ঠন করছে সরকার ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালীরা। রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের 'বাংলাদেশে বালু উত্তোলন মানচিত্র-২০২৩' শিরোনামে পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুসারে, দেশের ৭৭টি নদীর ১৩২টি পয়েন্ট থেকে ২৬৫ ব্যক্তি অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করেছেন, যাদের মধ্যে অন্তত ৫৪ জন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও ১৯২ জন প্রভাবশালী। নদ-নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কারণে নদীতে ব্যাপক ভাঙনের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি, জমিজমা হারিয়ে নিঃস্ব হন।

> *দেশের ৭৭টি নদীর ১৩২টি পয়েন্ট থেকে ২৬৫ ব্যক্তি অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করেছেন, যাদের মধ্যে অন্তত ৫৪ জন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও ১৯২ জন প্রভাবশালী। নদ-নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের কারণে নদীতে ব্যাপক ভাঙনের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি, জমিজমা হারিয়ে নিঃস্ব হন।*

ফিটনেসবিহীন ও মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের ধোঁয়া, কলকারখানা ও ইটভাটা থেকে নির্গত ধোঁয়া, অবকাঠামো নির্মাণ ও রামতের কারণে সৃষ্ট ধুলা নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে বায়ু দূষণে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বের অন্যতম দূষিত রাজধানীর তালিকায় স্থান পেয়ে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বায়ুদূষণবিষয়ক শ্বিক প্রতিবেদন এয়ার কোয়ালিটি লাইফ ইনডেক্স-২০২৩ অনুসারে, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর দেশে পরিণত হয়েছে। এই দূষিত বাতাসে নি:শ্বাস নেওয়ার কারণে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু কমে যাচ্ছে প্রায় ছয় দশমিক আট বছর। বায়ু াণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা না নিয়ে সরকার নিজেই বায়ু ও পানি দূষণকারী কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছে, সেইসঙ্গে আইন করে দূষণের মানমাত্রা শিথিল করেছে। যেমন: বাংলাদেশে বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২-এ কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্গত বায়ুদূষণকারী উপাদানের সর্বোচ্চ মাত্রা বাংলাদেশে কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকারী চীন কিংবা জাপানের সর্বোচ্চ মাত্রার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি হারে নির্ধারণ করা হয়েছে।

> *দূষিত বাতাসে নি:শ্বাস নেওয়ার কারণে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু কমে যাচ্ছে প্রায় ছয় দশমিক আট বছর। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা না নিয়ে সরকার নিজেই বায়ু ও পানি দূষণকারী কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছে সেইসঙ্গে আইন করে দূষণের মানমাত্রা শিথিল করেছে।*

এভাবে দেশি–বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মুনাফার স্বার্থে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি অবহেলার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বাংলাদেশের বাতাসে পিএম ২.৫-এর মাত্রা সাত গুণের বেশি হওয়ায় বিপুলসংখ্যক মানুষ এসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, যার ফলে প্রতিবছর ৭৮ থেকে ৮৮ হাজার মানুষ বায়ুদূষণের শিকার হয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করছেন।[৪৫] সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা পালন করেইনি, উল্টো নিজেরাই পরিবেশ ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হয়েছে। তারা সংরক্ষিত বনকে পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করেছে, উন্নয়ন প্রকল্পের নামে প্রকৃতি বিরোধী নানা ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করেছে, গাছ কেটেছে, পাহাড় কেটেছে, জলাধার ভরাট করে ভবন নির্মাণ করেছে, দূষণকারী কয়লা ও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছে, নদীদূষণ করছে।

ভারতের সঙ্গে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ও জালিয়াতির নির্বাচন করে ক্ষমতায় থাকার সমর্থনের বিনিময়ে হাসিনা সরকার বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারতকে একতরফা নানান সুবিধা দিয়ে গেছে। যার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সড়ক, নৌ ও রেলপথে ট্রানজিট, সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুবিধা, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ভারতীয় কারি-বেসরকারি কোম্পানির প্রবেশাধিকার, ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের সুন্দরবনের কাছে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সুযোগ, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, বিশেষ অর্থনৈতিক ঞ্চল, সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম বিক্রয় ইত্যাদি। অথচ এ সময় ভারত বাংলাদেশকে আন্তসীমান্ত নদীর পানির ন্যায্য হস্যাটুকুও দেয়নি, তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি সই করেনি, পাট পণ্য রপ্তানির ওপর এন্টিডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছে, সীমান্তে টাতারের বেড়া দিয়েছে এবং নির্বিচারে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা করেছে।

ইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাবে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল এই ১৪ বছরে ৫৯৪ জন বাংলাদেশি বিএসএফের গুলিতে বা র্যাতনে নিহত হয়েছেন।[৪৬] হাসিনা সরকারের দিক থেকে এসব সীমান্ত হত্যা বন্ধে ভারতের ওপর চাপ প্রয়োগ তো দূরের কথা, কড়া প্রতিবাদ জানানোরও নজির নেই। ভারতকে যে বাংলাদেশ এক তরফাভাবে নানান সুবিধা দিয়ে গেছে তা শেখ সিনা নিজেও স্বীকার করেছেন। ২০১৮ সালের মে মাসে ভারত সফর শেষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, ‘ভারতকে যা দিয়েছি, তারা তা সারা জীবন মনে রাখবে।’ ‘দিল্লির পাশে থাকছে ঢাকা, মোদির কাছে “প্রতিদান” চান হাসিনা’ শিরোনামে ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকার একটি সংবাদের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি কোনো প্রতিদান চাই না। প্রতিদানের কী আছে?’ [৪৭] শেখ হাসিনা তার পুরো শাসনামলে ভারতকে এক তরফা সুবিধা দিয়ে যাওয়া ও প্রতিদান না চাওয়ার নীতিতে অটল ছিলেন।

এসব কারণে শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ বারুদের বিশাল স্তূপের মতো জমা হচ্ছিল। জুলাই মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন দমনে শত শত তরুণকে সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলি করে নির্বিচারে হত্যার ঘটনা বারুদের এই স্তূপে স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করেছে। যা শেষ পর্যন্ত হাসিনার দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়েছে।

কল্লোল মোস্তফা: লেখক, গবেষক। ***ইমেইল:*** kallol_mustafa@yahoo.com

তথ্যসূত্র

১। “গণ–অভ্যুত্থানে ৮০০ জন নিহতের নাম পাওয়া গেছে: তথ্য উপদেষ্টা”, *প্রথম আলো*, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪; “ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থান: আহতের সংখ্যা ১৮ হাজারের বেশি”, *প্রথম আলো*, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪।

২। “ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মোট মামলা ৭০০১টি: সংসদে আইনমন্ত্রী”, *প্রথম আলো*, ০৫ জুন ২০২৩

৩। “‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক বেশি অভিযুক্ত’”, *প্রথম আলো*, ৩০ এপ্রিল ২০২৪

৪। “এখনো নিখোঁজ ১৫৩ জন, অপেক্ষায় স্বজনেরা”, *প্রথম আলো*, ৩০ আগস্ট ২০২৩